দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 02 FEB 1987 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল

'শূন্যের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি পাঠাগারের মধ্যে মানবহৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়'—এ উচ্চারণ রবীন্দ্রনাথের। পাঠাগার সম্পর্কে তাঁর মুগ্ধতা অন্তহীন: 'কে জানিত সঙ্গীতকে হৃদয়ের আকাশে, জাগ্রত আত্মার আনন্দ-ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়ে রাখিবে? কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে?'

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পাঠাগারকে আমরা দেখিনি—দেখিও না। তাই পাঠাগার আমাদের মধ্যে বিস্ময়, আলোড়ন, আকর্ষণ কিছুই সৃষ্টি করে না—এমন কি এর ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও ভাবিত হতে উদ্বুদ্ধ করে না। পাঠাগারকে আমরা বিশেষ বা সাধারণ—কোনভাবেই ভালোবাসি না।

পাঠাগারের প্রতি এমন নিস্পৃহতার জন্য দায়ী আমাদের পরিবেশ—সে পরিবেশ 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোলে'র প্রতি আগ্রহী হতে দীক্ষা দেয় না। পাঠের প্রতি আমরা স্বভাব-উদাসীন। 'পাঠ' যেখানে তুচ্ছ, পাঠাগার তো সেখানে অর্থহীনই।

আমাদের অনেক কিছু চাই, এই চাহিদার তালিকায় পাঠাগারের নাম নেই। পাঠাগার শ্লাব নয়, যেখানে আড্ডা দেয়া যায়। পাঠাগার খোলা ময়দান নয়, যেখানে বাতাস খাওয়া যায়। পাঠাগার কম্যুনিটি সেন্টার নয়, যেখানে বিয়ে খাৎনা আকিকা উৎসব করা যায়। 'মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃংখলে কাগজের' এই 'কারাগারে' তাহলে আমাদের কী লাভ?

লাভ নেই। নেই বলে লোকসানের খাতায় নাম লেখানো আমাদের নীতিতে মানা। আমরা আনন্দ চাই। এ আনন্দের জন্য আমরা ভিসিআর দেখতে যাই, রঙীন টিভি'র জন্য হন্যে হই। আনন্দের জন্য চিড়িয়াখানায় যাই। সিনেমা দেখি, সার্কাস দেখি, বন্দী-পাখির প্রদর্শনী দেখি। রিক্রিয়েশনের জন্য অর্থব্যয়ে আমাদের কুণ্ঠা আছে—এমন অপবাদ দেয়ার জো নেই।

আনন্দ শুধু পাঠে নেই। নেই বলেই বই-টইকে আমরা ডরাই। সাধ হয় না, কখনো একটি বই কিনি, খবরের কাগজটি পুরো পড়তেও আলস্য, শিরোনামে চোখ বুলিয়েই সব তথ্য জানা গেল। আর কেউ পড়ে যদি খবর বলে দেন, তবে তো আরও ভালো।

পড়া মানে পাঠ্য বই। যার জন্য বয়স হতে হয় ছাত্রকালের। ঐ ছাত্রকালেই পাঠ্য বইয়ের চেয়ে টানে খুনের আর প্রেমের কাহিনী। সেই বয়স পার হলে পরীক্ষা নামক ফাঁড়াটাড়া কাটলে ঐটুকুন ইচ্ছেও মরে যায়। এর পরে জগত-জীবন নানা অর্থে ধরা দেয়—সে অর্থের কাছে পাঠপ্রেম নিরর্থক হয়ে যায়।

প্রেমের অভাবে সবই মরণ। এ সত্য খাটে পাঠের ক্ষেত্রেও। 'আকর্ষণের' মতোন প্রচন্ড একটি ইতিবাচক দিক নেই বলেই পাঠ বা পাঠের বিষয়টি পানসে হয়ে যাচ্ছে। কর্মের স্থল এ ধরাধামে কর্মবীর আমরা একটি ওষুধের লিটারেচারকেও দেখি আতঙ্কের চোখে। সে কেবলি ওটি পড়তে হবে বলে। না-পড়ার পক্ষে বলার অজস্র অজুহাত আমাদের আছে।

নির্বুদ্ধিতার স্তর আমরা কাটিয়ে উঠেছি—এ স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হবে অবশ্যি। আজ আমাদের বোধ বলে, বই না-পড়াটা নিয়ে গর্ব করার লজ্জা আছে। এ লজ্জা আর কেনো ক্ষতি না করলেও জ্ঞানচর্চায় অনীহা প্রমাণ করে সামাজিক জৌলুস খর্ব করতে পারে। অর্থাৎ তাত্ত্বিক দিকে পাঠ প্রবণতা প্রশংসনীয় হতে শুরু করেছে।

একেবারে—না থেকে এটুকু—হ্যাঁ পর্যন্ত পৌঁছুতে 'সিন্ধু লঙ্ঘিতে' না হলেও কিন্তর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। এ অভিযানের কিঞ্চিৎ ফলাফল আজ দেখা যায়। পাঠ, পুস্তক, পাঠাগার আমাদের চিন্তন চেতনে যেন মৃদুলয়ে ঘা দিতে চায়।

তবে পুস্তক ব্যাপারটি হালে যেমন মওসুমী বিষয় হয়ে উঠেছে তেমন আর কিছু নয়। ফেব্রুয়ারীকে সামনে রেখে আজকাল জানুয়ারীও এই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক গ্রন্থমেলা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক সেমিনার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অভিনন্দনযোগ্য দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নেই। বই সংক্রান্ত যেকোনও আলোচনা, সমালোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মেলা, প্রদর্শনীর ব্যাপকতা যতো হয়, ততোই কল্যাণ। এ কল্যাণ সার্বিক। নির্জ্ঞানদের চোখ ফোটে, অ-জ্ঞানদের চোখের অস্বচ্ছতা কাটে। নিছক কৌতূহল ক্রমে রূপ নেয় আকর্ষণে।

যুগপৎ কৌতুকের ও দুঃখের বিষয় হচ্ছে—লাইব্রেরী বলতে এখানে বই বিকিকিনির দোকানকেই সাধারণত বোঝায়। এর পরে লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার মনে হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার। অর্থাৎ এর সঙ্গে অবশ্য পাঠ বা পাঠে বাধকতার পরিবেশ যেন যুক্ত। এমনি এমনি গ্রন্থাগার কোথাও গড়ে উঠেছে বা কেউ গড়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছে, এমন সচরাচর হয় না। গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়লে গ্রন্থ-বিপননের প্রসার মিটত—গ্রন্থ ব্যবসায় খোলতাই হত। বই বিকি হয় না—এমন অপবাদ ঘুচতো।

অপবাদ। এই ঢাকা শহরে বইয়ের দোকান জরিপ করলে ধরা পড়বে আজকাল মানুষ বই কেনে। কিনতে যায়। দাম বেশি হলে ভড়কে যায়। এই ভরকে যাওয়া ক্ষতিকর। ক্ষতি বইয়ের ব্যবসার। কেননা বই আলু-পটল নয় যে দাম বাড়লেও লোকে কিনতে থাকবেই। পরিবেশ বদলে গেলেও আজও বিজ্ঞানের ভাষা 'বই কিনুন', 'অমুক বই কিনুন' নয়।

বইয়ের দাম কেন বেশি হয়? উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা ও অগ্নিমূল্য। ফলে সমস্যায় আছেন বই ব্যবসায়ীরা: আর লেখেন যিনি তিনিও লেখায় ফুলটাইম হবেন, এমন পথ নেই। খ্যাতি প্রতিষ্ঠা দূরে থাক—দিনের খাওয়াই দিন জুটবে না। অতএব তাঁদেরও লেখা 'সাইড'। এতো সাইড-এর পাল্লায় পড়ে বই-চকচটই কোণঠাসা হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ সাইডে চলে গেছে।

বই চালু অর্থাৎ বিকির একটি নিশ্চিত পথ হচ্ছে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বই কেনার জন্য বাধ্যতা সৃষ্টি। উল্টো দিকে শোনা যায়—দেশে অত বই কোথায়? এক একটি বই লেখক প্রকাশক যৌথ উদ্যোগে বের করেন. ভাগ্যবান লেখক হলে প্রকাশক নিজেই করেন তাও কতো সংখ্যায়? পাঁচশ থেকে বারোশ পঞ্চাশের বেশি নয়। এই বই কতদিনে কাটে? টাকা কতো দিন আটকে থাকে?

সরকার থেকে স্কুলে কলেজে বই-মঞ্জুরি বাবদ অর্থ নগদ-যা দিয়ে বই কিনে দেয়ার প্রথা চালু হয়েছিল। প্রত্যন্ত এলাকায় গ্রন্থাগার তৈরি করে নতুন বই কমপক্ষে দু কপি করে কিনতে নির্দেশ দেয়া হবে এও সুপারিশ ছিল। এ সুপারিশ গৃহীতও হয়েছিল যুক্তিসঙ্গত বলে।

তাহলে?

সারাদেশে গ্রন্থাগার বাড়তে থাকলে এবং বিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ে বই অনুদান দলে বারোশ পঞ্চাশ কেন বারো হাজারও কি যথেষ্ট হতে পারে?

এসব তর্ক মেলা হয়েছে। কাজ হয়নি। এবার প্রধানমন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, দেশের সকল জেলা পরিষদেই গ্রন্থাগার হবে। উপজেলা পরিষদ এবং পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন পরিষদগুলোতেও গ্রন্থাগার স্থাপনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন।

আশা করা যায় এবার হয়ত কাজ সত্যি শুরু হবে। আসল কথা হচ্ছে—আমরা সবাই গ্রন্থ পেতে চাই, গ্রন্থ পড়ার অভ্যাস ব্যাপক হতে দিতে চাই, গ্রন্থাগার চাই। দেশের যেখানেই যাই—ভালো আধুনিক পদ্ধতির সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার চাই। এ চাওয়ায় ব্যত্যয় নেই। নেই বলেই একে বিতর্কের বিষয় করা অর্থহীন। গ্রন্থ আগে না গ্রন্থাগার? এমন প্রশ্ন তুলে পরিস্থিতি ধোঁয়াটে না করে সত্যিসত্যি ফল চাই। আগেপরে নয়, পাশাপাশি একসঙ্গে।

—হোসনে আরা শাহেদ